মনে পড়ে

স্বামীজী ও সিস্টার নিবেদিতার স্মৃতি

শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয়পাত্র ছিলেন দার্জিলিঙের সরকারি উকিল মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সহধর্মিণী ভক্তিমতী কাশীশ্বরী দেবীও ছিলেন স্বামীজীর মন্ত্রশিষ্যা। তাঁদের প্রথম তিন সন্তান যথাক্রমে বলেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ এবং শৈলেন্দ্রনাথ স্বামীজীর কৃপালাভে ধন্য হয়েছেন। ভূপেন্দ্রনাথ কলকাতা পুলিসের প্রথম ভারতীয় ডেপুটি কমিশনার। শৈলেন্দ্রনাথ (১৮৮৪-১৯৪৪) কৈশোরে বেলুড় মঠে স্বামীজীর কাছে থেকে বালি টমসন স্কুলে ও কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশোনা করেন। লন্ডনের গ্রে'স ইন কলেজ থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে তিনি হয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের কৃতী ব্যারিস্টার। পরিণত বয়সে তিনি স্বামীজী ও সিস্টার নিবেদিতার পুণ্যস্মৃতি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা রুমা মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে ইংরেজি স্মৃতিকথাটি সংগ্রহ এবং অনুবাদ করেছেন **তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**।]

পরিণত বয়সে রোগশয্যায় শুয়ে কেবলই স্বামীজী ও সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাতের দিনগুলির কথা মনে হচ্ছে। এ-যাবৎ কত আত্মীয়-পরিজন ও বন্ধুবান্ধব এ-প্রসঙ্গে লেখার জন্য বহু অনুরোধ করেছেন। কেন জানি না, কখনও এসব কথা লিখে রাখার তাগিদ অনুভব করিনি। এরও যে আবশ্যকতা আছে সেকথা কখনও মনে হয়নি। সেই মধুর স্মৃতি ইদানীং বারবার মনের পটে ভাসে। এ হয়তো অচিরেই তাঁদের সঙ্গে পরলোকে মিলিত হওয়ার সংকেত। জানি না স্বামীজী মহারাজের কী অভিপ্রায়!

স্বামীজী যখন প্রথম আমাদের দার্জিলিঙের বাড়িতে (বলেন ভিলায়) আসেন তখন আমার বয়স এগারো কী বারো। দার্জিলিং সেন্ট জোসেফ স্কুলে পড়ি। পড়াশোনা ভাল হচ্ছিল না। কেবল বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে হইহই করে বেড়াতাম। সর্বদাই খেলাধূলায় মত্ত থাকতাম। স্বামীজী আমাদের খুব ভালবাসতেন। আমার পরের দু-ভাই তখন খুব ছোট (ন-ভাই দ্বিজেন্দ্রনাথ ছয় বছরের এবং ছোট রবীন্দ্রনাথ চার বছরের)। বড়দা (বলেন্দ্রনাথ) ও মেজদা (ভূপেন্দ্রনাথ) তখন কাজে ব্যস্ত। আমিই একমাত্র পড়ুয়া ছেলে। কাজেই স্বামীজীর প্রাতঃকালীন ও বৈকালিক ভ্রমণের বেশিরভাগ সময় আমিই তাঁর সঙ্গী হতাম। সঙ্গে আমার দু-একজন বন্ধুকেও ডেকে নিতাম। স্বামীজী হ্যাট-কোট-বুট পরে হাতে স্টিক নিয়ে আমাদের সঙ্গে বেড়াতে বেরুতেন। তিনি খুব মজার মজার কথা বলতেন।

একদিন সকালের দিকে তাঁর সঙ্গে আমরা

বেড়াতে বেরিয়েছি, দেখি একটু দূরে এক বৃদ্ধা মুটেনি পিঠে মাল বইতে বইতে হঠাৎ পায়ে হোঁচট লেগে পড়ে গেল। তার খুব লেগেছিল। উঠতে পারছিল না। আমরা দেখলাম, একটু পরেই স্বামীজী 'উঃ' বলে মুখে শব্দ করে বসে পড়লেন। ভাবলাম হয়তো তাঁর শরীর খারাপ লাগছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ''আপনার কি কষ্ট হচ্ছে? তা হলে চলুন বাড়ি ফিরে যাই।'' কিছুটা সামলে নিয়ে উনি বললেন, ''বেটা, দেখতে পাচ্ছিস না, ওই মুটেনির অবস্থা?'' স্বামীজীর এই উক্তির তাৎপর্য সেদিন বুঝতে পারিনি, পরে বুঝেছিলাম, তিনি এত সূক্ষ্ম মানসিক অবস্থায় থাকেন যে, অন্যের কষ্ট ও আনন্দ নিজ শরীরে অনুভব করতে পারেন। যাই হোক, রাস্তার লোকেরা সেই মুটেনিকে তুলে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিল। তার বাড়ি ছিল আমাদের বাড়ির কাছেই। স্বামীজী আমার মাকে সেই মুটেনির কষ্টের কথা বলেছিলেন। তাঁর ব্যথা অনুভব করেই মা সেই মুটেনির চিকিৎসার ভার নেন।

স্বামীজী যখন দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয়বার আমাদের বাড়িতে আসেন তখন মা তাঁকে বলেছিলেন, ''শৈল-র পড়াশোনা এখানে হচ্ছে না। কী করা যায় বলুন তো?'' স্বামীজী কিছুক্ষণ মৌন থেকে বলেছিলেন, ''ওকে বেলুড় মঠে পাঠিয়ে দিন। কয়েকটি ছেলে ওখানে থেকে পড়াশোনা করছে, ও-ও তাদের সঙ্গে পড়াশোনা করবে। স্বাবলম্বী হবে। এতে ওর ভাল হবে।'' সেদিন স্বামীজীর এই কথাগুলির তাৎপর্য বুঝিনি। তবে ভবিষ্যৎ জীবনে ভাল যে আমার হয়েছিল তা অনুক্ষণ বুঝতে পারি। স্বামীজীর নির্দেশমতোই ১৮৯৯ থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত আমি বেলুড় মঠে থেকে বালির স্কুলে এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশোনা করি।

আমাদের বাড়িতে থাকাকালে একবার স্বামীজী খুব অসুস্থ হন। ভয়ংকর ডায়রিয়া। মা তো ভীষণ চিন্তায় পড়েছিলেন। স্বামীজীর শরীর এত দুর্বল হয়ে গিয়েছিল যে, তাঁর আর শৌচে যাওয়ারও ক্ষমতা ছিল না। আমি তখন তাঁর কাপড় পালটে দিতাম, গা মুছিয়ে দিতাম, ডাক্তারের নির্দেশমতো ওষুধ দিতাম। ভিক্টোরিয়া হসপিটালের ডাক্তার ডেভিসের চিকিৎসায় তিনি ছ-সাত দিন পর সুস্থ হন।

বেলুড় মঠে অবস্থানকালে মাঝে মাঝে বিকেলের দিকে স্বামীজীর সঙ্গ পেতাম। আমরা পাঁচ-ছয় জন বালক তখন বেলুড় মঠে থাকি। বিকেলে মাঠে ফুটবল খেলা ও ছোটাছুটি করা ছিল বাধ্যতামূলক। মাঝে মাঝে স্বামীজী মাঠে এসে দেখতেন, কে আসেনি। কোনও কারণে যে হাজির হত না, তার জন্য বকুনি তোলা থাকত। আমাদের মধ্যে কয়েকজনকে স্বামীজী সাঁতার শিখিয়েছিলেন। সেটা ছিল রবিবারের প্রোগ্রাম।

এ-প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে পড়ছে— তরমুজের শরবত তৈরির শিক্ষাদান। এক গ্রীষ্মের বিকেলে স্বামীজী আমাকে তলব করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন আমি তরমুজের শরবত করতে জানি কি না। জানি না শুনে বললেন, ''রান্নাঘর থেকে ডালকাঁটা আর লুচি ছাঁকার ছানতাটা নিয়ে আয়। আর একটা বড় কোনও ঘটি পেলে আনিস।'' আমি ঠাকুরমশাইকে বলে একটা বড় ঘটি, ডালকাঁটা ও ছানতা নিয়ে হাজির হলাম। তিনি বললেন, ''ছুরি দিয়ে তরমুজটা কাট।'' আমি তরমুজের ছাল বাদ দিয়ে সেটা টুকরো টুকরো করে একটা বড় ঘটিতে রাখলাম। পরে বললেন, ''এবার ডালকাঁটা দিয়ে ওর মধ্যে জোরে জোরে ঘোরা।'' কিছুক্ষণ পর সেটা শরবতের রূপ নিল। তারপর গ্লাসের ওপর ছানতাটা রেখে শরবত ঢালা হল। তিনি বললেন, ''একটু করে নুন ছিটিয়ে খা, বাকিদের ডেকে এনে দে।'' আমি স্বামীজীকে আগে দিলাম। খেয়ে বললেন, "Excellent হয়েছে।"

স্বামীজী যখন শেষবার দার্জিলিং গিয়েছিলেন তখন মা স্বামীজীকে বলেছিলেন, ''ওর দাদাদের

দীক্ষা হয়ে গেছে, ওই কেবল বাকি থাকে কেন, ওকেও কৃপা করুন স্বামীজী।" স্বামীজী তখন বললেন, ''শৈল, চল আজই তোকে দীক্ষা দেব। আমার ঘরে আয়।" আমি স্বামীজীর ঘরে গেলে, তিনি দরজা বন্ধ করে মেঝেতে দুটো আসন পাততে বললেন। একটাতে তিনি বসলেন, আর একটাতে আমি। তারপর আমার কানের কাছে তিনবার মহামন্ত্র উচ্চারণ করে আমাকে বলতে বললেন। প্রথমবার ঠিকমতো বলতে না পারায়, আবার বলে ঠিক করে দিলেন। তারপর জপের প্রণালী শিখিয়ে দিলেন। দীক্ষাদানের পর তিনি নিজের পকেট থেকে কিছু পয়সা বার করে টেবিলের ওপর রেখে বললেন, ''ওখান থেকে আমাকে একটা পয়সা দে।" আমি তাঁর হাতে পয়সা দিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি আমার মাথায় হাত রেখে জপ করলেন। সেই মুহূর্তে আমার সারা শরীরে যেন এক বিচিত্র তরঙ্গপ্রবাহ খেলে গেল—সে-অনুভূতির কথা আমি বোঝাতে পারব না।

স্বামীজীর মহাপ্রয়াণকালে আমি বেলুড় মঠে ছিলাম না। কোনও কারণে দার্জিলিং না কোথায় গিয়েছিলাম স্মরণে নেই। তবে সে-সংবাদ পেয়ে কয়েকদিন খুব কেঁদেছিলাম। তখন একদিন স্বামীজীকে স্বপ্নে দেখলাম। সেই কালো কোট, মাথায় টুপি, পায়ে বুটজুতো। বললেন, ''কী রে, কাঁদছিস কেন? আমি কি চলে গেছি নাকি!" আমি আনন্দে তাঁকে প্রণাম করতে গেলাম। দেখি তিনি দূরে চলে গেলেন। তখনই ঘুম ভেঙে গেল। স্বামীজীর সুখস্মৃতি ও আশীর্বাদ সম্বল করেই পরপারের ডাকের অপেক্ষায় আছি।

মা-বাবা কলকাতায় এলে বেলুড় মঠে স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন। সিস্টার নিবেদিতার উপস্থিতিতেই একদিন তাঁরা এলে স্বামীজী সিস্টারের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেন এবং আমাকেও ডেকে পাঠান। সিস্টারকে আমার সেই প্রথম দর্শন। দ্বিতীয় দর্শনটি একটু কৌতুককর। একদিন বিকেলে নৌকা করে বাগবাজার থেকে সিস্টার এসেছিলেন স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে। দুপুরে কিছু বৃষ্টি হয়েছিল। এক জায়গায় উপরে ঘাস আর নিচে কাদা। সিস্টার দ্রুত চলতেন। সেখানে পা পড়তেই তাঁর জুতো কাদায় আটকে গেল। তিনি তখন খুব অস্থির হয়ে উঠেছেন। তাঁর সঙ্গে যে-সন্ন্যাসী ছিলেন তিনি তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করছেন। স্বামীজী তাঁর ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে খুব হাসছেন। আমি তাঁর কাছেই ছিলাম। স্বামীজী আমাকে বললেন, ''শৈল, ছুটে যা, সিস্টারের জুতো দুটো পরিষ্কার করে দিয়ে আয়।" বলামাত্র ছুটলাম। আমি জুতো চাইতে সিস্টার 'নো, নো' বলে আঁতকে উঠলেন। যে-সন্ন্যাসী তাঁর সঙ্গে ছিলেন, তাঁর কথায় উনি কাদা থেকে সরে এসে জুতো জোড়া খুললেন। সেই মুহূর্তেই আমি জুতো নিয়ে ছুট দিলাম। ওঁরা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। আমি জুতো ধুয়ে মুছে তাঁর কাছে দিয়ে এলাম। তখন সিস্টার আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, ''ওঃ সুইট নটি বয়!" পরে আমার শৈল নামটা উচ্চারণ করতে না পেরে তিনি আমাকে 'সলেন' বলে সম্বোধন করতেন।

মা-বাবার সঙ্গে পরিচয় থাকার সুবাদে সিস্টার দার্জিলিং বেড়াতে এলেই আমাদের বাড়িতে আসতেন। দার্জিলিঙে তাঁর সঙ্গে আমার মাত্র দুবার সাক্ষাৎ হয়েছিল—১৯০৯ আর ১৯১১ সালে। ১৯০৯ সালে আমি বিলেত থেকে সদ্য ব্যারিস্টারি পাশ করে ফিরেছি। কলকাতাতেই থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। সকলের সঙ্গে দেখা করতে দার্জিলিং গিয়েছিলাম। সেখানে সিস্টারের সঙ্গে দেখা হল। আমাকে দেখেই খুব আনন্দ প্রকাশ করে জানতে চাইলেন, আমি কি তাঁকে কয়েকটা পাহাড়ি গ্রাম দেখাতে পারি? আমি সম্মতি জানালে খুশি হলেন। একদিন সকালের দিকে আমাদের বাড়ির বাহাদুরকে

সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করলাম, কারণ তার বাড়িও ওই গ্রামে। যেতে যেতে তিনি আমাকে বলেছিলেন, ''আমি জানতে চাই—এদের দিন চলে কীভাবে? এরা পড়াশোনা শেখে না কেন? এদের মেয়েরা বেশি পরিশ্রম করে কেন? এরা কোন দেবতার উপাসনা করে? এরা কী খেতে, কী পরতে পছন্দ করে? এদের festival কী?''—এমন হরেক প্রশ্ন।

দুটি গ্রাম সিস্টারকে দেখিয়েছিলাম। একটি গ্রামে বুদ্ধদেবের ছোট মন্দির ছিল। সিস্টার তাদের পুরোহিতকে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন, আমি সেগুলি দেশি ভাষায় সেই লামাকে বলেছিলাম। সিস্টার মন্দিরটির চারদিক ঘুরে একবার প্রার্থনায় বসেছিলেন। কয়েকটি মহিলাকেও জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তাদের কি পড়াশোনা করতে শখ হয় না? তাদের বিবাহ অনুষ্ঠান কীরকম? মৃতদের সৎকার করা হয় কীভাবে? আমি এক্ষেত্রেও দোভাষীর কাজ করেছিলাম। গ্রাম দুটি ঘুরে সেখানকার মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে সিস্টারের কী আনন্দ! পরে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এই নেপালি, ভুটিয়া ও পাহাড়িদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য কী? আমি চুপ করে থাকলে তিনি বলেছিলেন, এরা সকলেই সাহসী, পরিশ্রমী আর ধর্মপ্রাণ। তখন অনুভব করেছিলাম সিস্টার আমাদের দেশকে কত ভালবাসেন!

সাল ১৯১১। পূজার ছুটিতে আমি সপরিবারে দার্জিলিং গিয়েছিলাম। সেখানে পৌঁছে জানলাম, সিস্টার আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুদের সঙ্গে দার্জিলিং এসেছেন এবং রায়ভিলায় উঠেছেন। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে শুনলাম তিনি ভীষণ অসুস্থ। তার মধ্যেই তিনি আমাদের বাড়ির সকলের খোঁজ নিলেন। আচার্য বসু একবার ডাক্তার নীলরতন সরকারকে কল দিতে চাইলেন। আমি বললাম, আমি যাচ্ছি। আমি জানতাম তিনি দার্জিলিঙে এলে কোথায় ওঠেন। তারপরই আমি ডাক্তার সরকারের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আবার রায়ভিলায় যাই। ডাক্তারবাবু সাধ্যমতো চিকিৎসা করেছিলেন। আচার্য বসুর স্ত্রী মায়ের মতো তাঁর সেবা করতেন। তখন প্রায় প্রতিদিনই সিস্টারের খোঁজ নিতে রায়ভিলায় যাতায়াত করেছি। কিন্তু কোনও চেষ্টাই সফল হল না। সিস্টার আমাদের সকলকে কাঁদিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণচরণে আশ্রয় নিলেন।

সিস্টারের অসুখ যখন বাড়াবাড়ির মুখে, আমার মা-ও সিস্টারকে দেখতে গিয়েছিলেন। দার্জিলিঙের বহু মেম মায়ের বান্ধবী ছিলেন। মা তাঁদের সঙ্গে সিস্টারের পরিচয় করিয়ে দেন। ওই চকবাজার অঞ্চলে তখন কলকাতার বহু লোক বাস করত। গ্রীষ্মের আর পুজোর ছুটিতে দার্জিলিং বাঙালিদের ভিড়ে গমগম করত। শুনেছি স্বদেশি আমলে বহু মানুষ ওখানে চান্দমারি এলাকার হিন্দু পাবলিক হলে মিলিত হতেন। হলটি আমার বাবার উদ্যোগেই গড়ে উঠেছিল। এই হলে স্বামীজী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সিস্টারও এখানে বক্তৃতা দিয়ে সকলকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। সেকালের বহু স্বদেশি সমর্থক—গোখলে, রাসবিহারী ঘোষ, পি. মিত্র, আনন্দমোহন বসু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখ ওই হলে সমবেত হতেন। সকলের সঙ্গেই বাবার ও মায়ের যোগাযোগ ছিল।

সিস্টার প্রয়াতা হলে তাঁর শেষকৃত্যের বস্ত্র ও গঙ্গাজল আমাদের বাড়ি থেকে নিয়ে গেলাম। সেই পবিত্র শবযাত্রাতেও অংশ নিয়েছিলাম। দার্জিলিঙের হিন্দু শ্মশানে তাঁর দেহ হিন্দুমতেই সৎকার করা হয়েছিল।

চিতার আগুন নিভে এলে আমার দুচোখ বেয়ে জলধারা নেমে এল। মনে মনে বললাম, ''মমতাময়ী সিস্টার, এই শীতল শৈলশহরে তুমি শান্তিতে ঘুমাও। কখনও প্রণাম নাওনি, এখন তোমার চরণযুগলে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম গ্রহণ করো।''